মহাভারতের এক উপাখ্যানের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

আনন্দমোহন ঘোষ

কথায় বলে—যা নেই (মহা) ভারতে, তা নেই ভারতে। মহাভারতের যুগে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল বিশ্বের মাত্র তিনটি দেশে—ভারতে, চীনে ও গ্রীসে। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন সকল ক্ষেত্রেই এগিয়ে ছিল ভারত। তাই সে যুগে ভারতে যা ছিল অজানা, বিশ্বের অন্য দেশেও তার চর্চা ছিল না বলে ধরা হয়। প্রশ্ন হতে পারে—কোন সময়টাকে মহাভারতের যুগ বলা হবে। যুগটা অবশ্যই রামায়ণের যুগের পরে এবং বৌদ্ধ যুগ শুরুর আগে—সময়টা আনুমানিক আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগের। ভারতের সেই অতীত যুগের ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শনের পরিণত রূপটি ধরা আছে মহাভারতের—নানা উপাখ্যান, উপদেশ ও উপমার মাধ্যমে।

বর্তমান যুগে Encyclopedia বা বিশ্বকোষ যেভাবে জানার সব বিষয়গুলিকে ধরে রাখে CD বা বইয়ের আকারে, প্রায় একইভাবে মহাভারতের যুগ পর্যন্ত ভারতীয় ঋষি মুনিদের আবিষ্কৃত (ধ্যানে, মননে ও অভিজ্ঞতায়) সব কিছুই স্থান পেয়েছে মহাভারতে। তবে মহাভারতের ক্ষেত্রে যে বিশেষ পার্থক্যটি লক্ষ্য করা যায়—সেটি হল গল্প বা উপমার সাহায্যে জটিল বিষয়গুলিকে সহজ করে সাধারণের মধ্যে উপস্থাপনা করার চেষ্টা। অন্যদিকে আধুনিক বিশ্বকোষ বা Encyclopedia-য় শুধু শিক্ষিতদের ব্যবহারের জন্যই অভিধানের রূপরেখায় বিষয়গুলিকে ধরে রাখা হয়। শুধু মহাভারতের পাঠ বা গল্প শুনেও অক্ষর পরিচয়হীন শিশু ও বয়স্করাও মনে রাখতে পারে মূল্যবান বহু তথ্য বা তত্ত্ব, কারণ সেগুলি বলা হয়েছে গল্প বা উপমা দিয়ে। গল্পবিহীন জ্ঞানের প্রকাশ যে সাধারণ পাঠক বা শ্রোতার মনে তেমন রেখাপাত করে না, তা আজ সিনেমা টিভির যুগে সবাই বোঝেন।

শিক্ষা বিজ্ঞানীরা আজ story telling method-এর উপযোগিতার কথা বিশেষ করে বলে থাকেন, যা প্রাচীন ভারতের ঋষি মুনিরা সভ্যতার উষাকালেই প্রয়োগ করে দেখাতে পেরেছিলেন, রামায়ণ মহাভারতের মধ্য দিয়ে, সারা বিশ্বকে। শিক্ষামূলক গল্পগুলির রচনা ও বাঁধনের ক্ষেত্রেও তাঁরা এমন দু-একটি সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করতেন—আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় যেগুলিকে বলা হয়—hyperlinkes এবং concept-symbol-name binding। আজকের TV-Computer-এর যুগে World Wide Web

(WWW) pages এবং cartoon প্রোগ্রামগুলি এই দুটি পদ্ধতিকে অবলম্বন করেই বৃদ্ধ থেকে শিশুদের চোখ আটকে রাখতে পারছে যন্ত্রের পর্দায়। এই প্রবন্ধে আধুনিক এই দুটি পদ্ধতির প্রয়োগ মহাভারতের কিভাবে করা হয়েছিল তা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হবে।

মহাভারতের মূল কাহিনীর নায়করা হচ্ছেন কৌরব ও পাণ্ডব বংশের রাজপুরুষেরা। পাণ্ডবরা সৎ ও ন্যায় নীতির আদর্শে বিশ্বাসী। অন্যদিকে কৌরবদের অন্ধ রাজা ও রাজপুত্ররা ছল, চাতুরি ও কৌশলে পাণ্ডবদের রাজ্য হস্তগত করে বনে পাঠিয়ে দেন তের বছরের জন্য। পঞ্চ পাণ্ডব দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে অতি সাধারণের মতন দিন কাটাতে থাকেন বনে বনে ঘুরে। তখনকার দিনে প্রত্যেক ঋষি মুনি ছিলেন এক একটি ভ্রাম্যমান বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁরা নিজ আশ্রমে যখন থাকতেন, তখন শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন, কিন্তু পরিব্রাজক অবস্থায় সর্বসাধারণকে জ্ঞান বিতরণ করতেন। রাজা ও ধনীরা যেমন জোগাতেন তাঁদের আশ্রমের খরচ, তেমনই নিজ আলয়ে আতিথ্য প্রদানও করতেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরদের বনবাস যখন এগারো বছরে পড়েছে তখন মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কয়েক দিনের জন্য তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠির মহর্ষির কাছে পাতিব্রত্য মাহাত্ম্যের কথা শুনতে চান। তখন ঋষি মার্কণ্ডেয় 'পতিব্রতা স্ত্রী এবং কৌশিক ব্রাহ্মণের কথা' বনপর্বের একটি উপাখ্যান) যুধিষ্ঠিরকে শোনাতে লাগলেন। পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার জন্য সেই গল্পমালার (পরপর নয়টি ভাগে সাজানো) সারাংশটি এখানে দেওয়া হল।

আদি কালে কৌশিক নামের এক ব্রাহ্মণ যোগ তপস্যা বলে কিছু বিশেষ শক্তি অর্জন করেন। একদিন ব্রাহ্মণ যখন গাছের তলায় বসে বেদপাঠ করছিলেন, তখন গাছের উপরে বসা একটি বক তাঁর ওপর বিষ্ঠা ত্যাগ করে। ক্রোধে ব্রাহ্মণ বকটির অনিষ্ট চিন্তা করে তাকাতেই বকটি গাছ থেকে পড়ে মারা যায়। এই ঘটনায় ব্রাহ্মণ অনুতপ্ত হলেও, নিজ শক্তির পরিচয় পেয়ে একটু অহঙ্কারের ভাবও জাগে তাঁর মনে। এরপর ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করতে গ্রামের একটি বাড়িতে যান। ভিক্ষা দাও বলে দরজায় দাঁড়াতে এক নারী একটু অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেন। গৃহের কাজ ও স্বামীর সেবা শেষ করতে নারীটির বেশ কিছুটা সময় লাগে। অপেক্ষায় ব্রাহ্মণ অসন্তোষ প্রকাশ করলে সতী নারীটি বলেন—স্বামী আমার সব থেকে বড়ো দেবতা, তাঁর সেবা শেষ না করে অন্য কাজে যাওয়া সম্ভব নয়। এই কথা শুনে তাপস কৌশিক বললেন—ব্রাহ্মণ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, সে ইচ্ছা করলে এই পৃথিবীকে ভস্ম করে ফেলতে পারে। উত্তরে নারীটি বললেন—তপস্বী বাবা, রাগ কোরো না, আমি সেই বক পাখি নই।—পতি সেবায় যে ধর্ম পালন হয়, সেটাই আমরা বেশি পছন্দের।—এই ধর্ম পালনের যে ফল, তার প্রমাণও তো আপনি পেলেন : ক্রুদ্ধ হয়ে বক পাখিকে দগ্ধ করেছেন, সেটি আমি জানতে পেরেছি। মানুষের মধ্যেই বাস করে যে বড়ো শত্রু : তার নাম ক্রোধ। তপস্যায় সেই শত্রুকে আপনি এখনও বিনাশ করতে পারেননি—পরম ধর্ম কি? সেটি আপনি যদি জানতে চান তাহলে মিথিলাপুরীতে গিয়ে মাতা-পিতার ভক্ত, সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় ধর্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করুন। উত্তরে

ব্রাহ্মণ রাগ না করে বললেন—দেবী! তোমার কল্যাণ হোক, আমি তা জানতে মিথিলায় যাব।

এরপর শুরু গল্পের পরের ভাগ 'কৌশিক ব্রাহ্মণের মিথিলায় গিয়ে ধর্মব্যাধের নিকট উপদেশ গ্রহণ' আখ্যানটি। কৌশিক ব্রাহ্মণ রাজা জনকের সুরক্ষিত মিথিলাপুরীতে গেলেন এবং ধর্মব্যাধের কসাইখানায় গিয়ে তাকে মাংস বিক্রি করতে দেখলেন। ব্রাহ্মণকে দেখে ধর্মব্যাধ বললেন— ভগবান! আপনার চরণে প্রণাম। আমি জানি সেই পতিব্রতা নারী আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। ধর্মব্যাধ ব্রাহ্মণকে গৃহে নিয়ে গেলেন এবং পা ধুইয়ে বসার আসন দিলেন। আসনে বসে ব্রাহ্মণ বললেন—মাংস বিক্রির কাজ তোমার উপযুক্ত নয়। উত্তরে ব্যাধ বলেন—এই ব্যবসা আমরা বংশে পিতা পিতামহের সময় থেকে চলে আসছে। আমি ধর্ম বিরুদ্ধ কোনো কাজ করি না। বৃদ্ধ বাবা-মায়ের সেবা করি, সত্য কথা বলি, কারো নিন্দা করি না। যথাসাধ্য দান করি এবং দেবতা, অতিথিদের সেবা করে তবে নিজে ভোজন করি। রাজা জনকের রাজ্যে এমন কেউ নেই যে, ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করে রেহাই পাবে। আমি মাংস খাই না, দিনে উপবাস করে শুধু রাত্রে ভোজন করি। কিছু লোক আমার প্রশংসা করে, কিছু লোক নিন্দা করে, কিন্তু আমি সবাইকে সদ্-ব্যবহারে সন্তুষ্ট রাখি।—যে কাজ অন্যের এবং নিজের পক্ষে মঙ্গলদায়ক সেই কাজই করি। এরপর ব্যাধের সঙ্গে ব্রাহ্মণের আলোচনা চলতে লাগল নানা বিষয় নিয়ে, যেমন—শিষ্টাচারের বর্ণনা, ধর্মের সূক্ষ্ম গতি, জীবাত্মরা নিত্যতা, ইন্দ্রিয়াদির অসংযমে ক্ষতি, ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় ইত্যাদি। সেগুলি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কৌশিকের সামনে ধর্মব্যাধ তুলে ধরলেন একে একে। সেই বর্ণ-বৈষম্যের যুগে ব্যাধ উপদেশ দিচ্ছে ব্রাহ্মণকে—আশ্চর্য্য লাগে না কি।

মার্কণ্ডেয় ঋষির গল্প বলা চলতেই থাকল। শুরু হল গল্পের নতুন আর একটি ভাগ 'ধর্মব্যাধের মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি'। ব্যাধ তখন ধর্মের থিওরি বলা শেষ করে প্র্যাকটিক্যাল জীবনে কিভাবে সেগুলিকে প্রয়োগ করা যায় তা ব্রাহ্মণকে দেখাতে চাইলেন। ব্যাধ বললেন—হে ব্রাহ্মণদেবতা, গৃহের ভিতর পদার্পণ করে আপনি আমরা পিতা-মাতাকে দর্শন করুন। ব্রাহ্মণ দেখলেন তাঁরা আহার শেষ করে প্রসন্ন চিত্তে এক সুন্দর আসনে বসে আছেন নিজ ঘরে। তাঁদের পুষ্প-চন্দন দিয়ে পূজা করা হয়েছে। ব্যাধ তাঁদের দেখেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। পুত্রকে আশীর্বাদ করে তাঁরা বললেন—তুমি দীর্ঘায়ু হও। তুমি উত্তম গতি, তপ, জ্ঞান এবং শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি লাভ করেছে। ব্রাহ্মণের মতন শম-দম পালন করেছে। তোমার মধ্যে আমাদের সেবা ব্যতীত আর কোনো চিন্তা নেই। তোমার শুভ হোক।

ব্যাধ এবার ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করে বললেন—মাতা-পিতাই আমার প্রধান দেবতা, দেবতাদের জন্য যা করা উচিত, তা আমি এঁদের জন্য করি। আলস্য ত্যাগ করে আমি সর্বদা এঁদের সেবায় ব্যাপৃত থাকি। মাতা-পিতার সেবাই আমার তপস্যা, এই তপস্যার প্রভাব দেখুন। এর প্রভাবে আমি দিব্য দৃষ্টি লাভ করেছি যার ফলে আমি জানতে পেরেছি

যে আপনি এক পতিব্রতা স্ত্রীর কথায় আমার এখানে এসেছেন—প্রকৃত ধর্ম কি জানার জন্য। এবার আপনাকে আমি আপনার মঙ্গলের জন্য কয়েকটি কথা বলতে চাই—মন দিয়ে শুনুন। আপনি তপস্যার জন্য পিতা-মাতার আদেশ না নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন, এতে তাঁদের অপমান করা হয়েছে। আপনার শোকে তাঁরা অন্ধ হয়ে গেছেন—আপনি ফিরে গিয়ে তাঁদের প্রসন্ন করুন। মাতা পিতার সেবা বিনা সবই ব্যর্থ। আমি এর থেকে বড়ো কোনো ধর্ম বুঝি না। উত্তরে ব্রাহ্মণ ব্যাধকে বললেন—তোমার ন্যায় ধর্মতত্ত্ব জানা লোক ইহজগতে দুর্লভ। অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হলে ধর্ম-অধর্ম বোঝা যায় না।

সে যুগে গুণের কতই না কদর ছিল। ব্রাহ্মণ বলেই চললেন—আশ্চর্যের বিষয়, সনাতন ধর্ম যার তত্ত্ব বোঝা কঠিন, তা শূদ্রের মধ্যেও বিদ্যমান। আমি তোমাকে ব্রাহ্মণ বলেই মনে করি। উত্তরে ব্যাধ জানালেন—পূর্বজন্মে আমি বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ ছিলাম, সঙ্গদোষে কুকর্ম করায় ঋষির দ্বারা শাপগ্রস্ত হই। এসব শুনে ব্রাহ্মণ ধর্মব্যাধকে প্রদক্ষিণ করে নিজ গৃহে ফেরার পথ ধরেন। গৃহে ফিরে তিনি মাতা-পিতার সেবা শুরু করেন। পরে প্রসন্ন মাতা-পিতার আশীর্বাদ লাভ করে তিনি প্রকৃত ধর্মবেত্তা হয়ে ওঠেন।

এমন অনেক শিক্ষামূলক গল্প মহাভারতে ভর্তি। গল্পগুলি ভাগ ভাগ করে সাজানো—যাতে বিষয়গুলি মনে রাখা সহজ হয়। উপদেশগুলি এক জায়গায় একত্রে না রেখে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে ফুলের মালার আকারে। উপদেশ বা তত্ত্বগুলিকে যদি ফুল বলে ধরা হয়—তবে সুতো বা hyperlink হিসাবে কাজ করেছে বিশেষ কিছু key words। গল্পের প্রথম ভাগের ফ্রেমে ধরা পড়েছে বক পাখি ও কৌশিক ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয়টিতে বক পাখি লিঙ্ক হিসাবে কাজ করেছে সতী নারী ও কৌশিক ব্রাহ্মণের মধ্যে এবং সেখানে নতুন একটি লিঙ্ক জোড়া হয়েছে ধর্মব্যাধের সঙ্গে। এভাবেই সমগ্র গল্পে নয়টি ভাগকে যুক্ত করা হয়েছে hyperlink ব্যবহার করে।

মনের পবিত্রতা, সেবা ও নিষ্ঠাযুক্ত সাংসারিক কর্ম যে ধর্মানুষ্ঠানের থেকেও বড়—সেই concept-দেখানো হয়েছে ব্রাহ্মণ ও ব্যাধের উপাখ্যানের মধ্যে। শুধু জন্ম-পরিচয়ে ধর্মবেত্তা হওয়া যায় না, নিষ্ঠাযুক্ত কর্ম-যোগে তা প্রাপ্ত হয়—সেটা বোঝাতে গল্পে শুরু হয়েছেন ব্যাধ, আর শিষ্য হয়েছেন ব্রাহ্মণ। কি সুন্দর symbol binding সমাজকে শিক্ষা দিতে।

বর্ণিত গল্পে আরও একটি মূল্যবান concept প্রকাশিত হয়েছে—সেটি হল হিন্দুর ধর্ম কেবলমাত্র rituals-এ আবদ্ধ নয়, তার মূল লক্ষ্য মানুষকে দেবত্ব দান করা। মানুষকে দেবতার মতন হয়ে ওঠার পথ দেখানোই ধর্মের আসল উদ্দেশ্য। আধুনিক ভারতবাসীকে মহাভারতের মূল্য বুঝতে, ভুলতে হবে প্রায় হাজার বছরের পরাধীনতার সংস্কার আর পশ্চিমকে অন্ধ অনুকরণ করার চেষ্টা। তাকাতে হবে সনাতন ভারতের উদ্দেশ্য ও আদর্শের দিকে। তবেই ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন পাবে।